ইকুইটিবিডি অবস্থানপত্র : বাংলাদেশ বাজেট ২০২৪-২৫, ২৯-জুন ২০২৪ইং

ঋণ দানে দাতা সংস্থার শর্ত দারিদ্রদের উপর কষাঘাত

কর বৃদ্ধি নয় বরং দূর্নীতি বন্ধ ও অর্থ পাচার রোধ হোক সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

ক. ঋন নির্ভরশীল জাতীয় বাজেট ২০২৪-২০২৫

সরকার ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ৭,৯৭,০০০ কোটি টাকার বাজেট ঘোষনা করছে, যা চলতি ২০২৩-২৪ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় ১২% বেশি। এ ছাড়া রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৫,৪১,০০০ কোটি টাকা যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১৩% বেশি এবং মোট বাজটের ৬৮%। মোট ঘাটতি বাজেট ২,৫৬,০০০ কোটি টাকা যা মোট জিডিপির ৪.৬%।

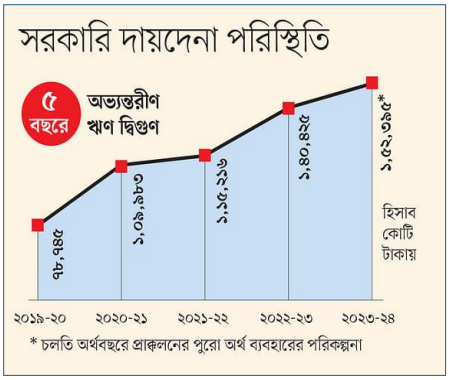

এই ঘাটতি মোকাবেলা করার জন্য সরকারকে আভ্যন্তরিন ও বৈদেশিক ঋণ এবং আভ্যন্তরিন অন্যান্য উৎসের উপর নির্ভর করতে হবে। যার মধ্যে ১,৫৬,০০০ কোটি টাকা আসবে অভ্যন্তরীণ খাত থেকে (যেমন ব্যাংক ঋণ, সঞ্চয়পত্র ও বন্ড বিক্রি, ইত্যাদি) এবং বাকি ১ লাখ কোটি টাকা নেওয়া হবে বিদেশি ঋণ হিসেবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের হিসাবে, গত ডিসেম্বর'২৩ মাস শেষে মোট ঋণের পরিমাণ ১৬,৫৯,৩৩৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ উৎসের ঋণ ৯,৫৩,৮১৪ কোটি টাকা এবং বিদেশি ঋণ ৭,০৫,৫২০ কোটি টাকা। এতে করে মাথাপিছু ঋণ দাড়িয়েছে ১,১৮,০০০ টাকা যা গত বছরের তুলনায় ১২,৭৭৫ টাকা বেশি। সরকারকে নতুন বছরে ১,১৩,৫০০ কোটি টাকা সুদ পরিশোধ করতে হবে যা ৩টি পদ্মা সেতু নির্মান ব্যয়ের প্রায় সমান। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ০৫ বছরে অভ্যন্তরীণ ঋণ দ্বিগুণ হয়েছে এবং গত এক দশকে বিদেশি ঋণ পরিশোধ বেড়েছে ১০৮%। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সুদ-আসলসহ বিদেশি ঋণ ৩০০ কোটি ডলারের বেশি পরিশোধ করতে হবে এবং নতুন বছরে তা হবে ৫০০ কোটি ডলারের মত, যা প্রায় ৬৭% বেশি। [প্রথমআলো, ০৪/০৬/২০২৪]

প্রতিবছর সরকার রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে তা কখনও অর্জন করতে পারেনা এবং প্রতিবারই এর লক্ষমাত্রা কমিয়ে আনা হয়। অন্যদিকে ফি-বছর পরিচালন ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের উচিত সরকারি পরিচালন ব্যয় পুন:পর্যলোচনা করে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করে কিছুটা হলেও রাজস্ব ঘাটতি মোকাবেলা করা। কারন সরকারকে বর্তমানে একটি কঠিন চেলেঞ্জের মধ্যে যেতে হচ্ছে, যেমন: (১) চরম মূল্যস্ফিতি, (২) বৈদেশিক রিজার্ভ ভয়াবহ আকারে কমে যাওয়া যা বর্তমানে কম-বেশি ১৯ বিলিয়ন ডলার (যা গত ডিসেম্বর ২০২০ অর্থাৎ কোভিড-১৯ এর সময় ৪২.৯৭ বিলয়ন ডলার ছিল), (৩) রিজার্ভ কমে যাওয়ায় বৈদেশিক বিনিয়োগ কমে যাওয়া (গত বছর শেষে যা ছিল ৩ বিলিয়ন ডলারের সামান্য বেশি এবং ২০২২ সালে তা ছিল ৩.৫ বিলিয়ন ডলার। সুত্র: বাংলাদেশ ব্যাংক, ২৮/০৫/২০২৪), (৪) রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্র অর্জন করতে না পারা, (৫) মেগা প্রকল্পের বিদেশি ঋন পরিশোধ শুরু, (৬) অর্থপাচার ও দূর্নীতি বৃদ্ধি, (৭) আর্থিক খাতের বিশৃঙ্খলা, (৮) ঋন নির্ভরতা বৃদ্ধি, (৯) ডলারের মূল্য বৃদ্ধির চাপ, (১০) বিদেশি কোম্পানীর ৫০০ কোটি ডলার আটকা, ইত্যাদি।

খ. ঋণ দানে দাতা সংস্থার শর্ত যা দরিদ্রকে আরোও দারিদ্র করছে

নতুন বাজেটে যে রাজস্বনীতি ঘোষণা করা হয়েছে, তাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পরামর্শ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। কারন আইএমএফ ৩০টি শর্তে সরকারকে ৪.৫ বিলিয়ন ঋণ দিতে রাজি হয়েছে এর মধ্যে অন্যতম শর্ত হচ্ছে (১) বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল ও গ্যাসের ভর্তুকি কমানো এবং মূল্য বৃদ্ধি করা, (২) করের হার ও এর আওতা বাড়ানো বিশেষ করে ভ্যাট বা পরোক্ষ করের হার ও আওতা বাড়ানো, (৩) ব্যক্তি কর বৃদ্ধি (২৫% হতে ৩০% করা), (৪) কর্পোরেট কর কমানো (২২% হতে ২০% করা), (৫) আমদানি শুল্ক কমানো, (৬) ব্যাংক সুদের লক প্রথা তুলে দেয়া (ফলে ব্যাংক গুলো সিঙ্গেল ডিজিট থেকে বের হয়ে ডাবল ডিজিটে চড়া সুদে ঋন দিচ্ছে), ইত্যাদি। এর ফলে আমদানি ব্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণ প্রবাহ কমে গেছে ও দ্রব্যের মূল্যস্ফিতি ঘটছে। ফলে একদিকে জনগণের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত/নিম্ন মধ্যবিত্ত/ গরীবের কাঁধে যেমন করের বোঝা চাপানো হচ্ছে তেমনি ভর্তুকি কমিয়ে দিয়ে জীবনযাত্রা ব্যয় আরও বেশী বাড়ানো হচ্ছে যা ক্রমান্বয়ে অসহনীয় হয়ে উঠছে। অথচ আইএমএফ অর্থপাচার রোধ, দূর্নীতি কমানো ও সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমানোর কোন কথা বলছে না।

ভর্তুকির টাকা জনগনের কল্যানে না ব্যয় করে কর্পোরেট ও বিশেষ ব্যবসায়ি শ্রেনীর কল্যানে ব্যয় হচ্ছে। নতুন বছরের বাজেটে ভর্তুকি বাবদ ১,০৮,২৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু এই ভর্তুকির কোথায় ব্যয় করা হবে? আইএমএফ-এর মরামর্শে বিদ্যুতের দাম বছরে চার বার বাড়ানোর চিন্তা করছে। এই ভর্তুকির ৩৭% বা ৪০,০০০ কোটি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে বিদ্যুত খাতে যার প্রায় ৮১% যাবে ক্যাপাসিটি চার্জ ব্যয়ের জন্য।

গত ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ক্যাপাসিটি চর্জ বাবদ দেয়া হয় ২৮,০০০ কোটি টাকা যা ২০১৭-১৮ সালে ছিল ৫,৬০০ কোটি টাকা। যা ৫বছরে ৫গুন বা ৪০০% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গত ১৪ বছরে গচ্ছা ৯০,০০০ কোটি টাকারও বেশি। একটি বিশেষ ব্যবসায়ি মহলকে এই সুবিধা দেয়া হচ্ছে বলে আমরা মনে করি এবং এদের জন্য রয়েছে বিশেষ "দায়-মুক্তি আইন"।

চুক্তি অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন হোক আর না হোক, বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর এই ক্যাপাসিটি চার্জ সরকারকে দিয়ে যেতে হবে অথচ বিদ্যুৎ উৎপাদের ৪০% থেকে ৪৮% অব্যবহৃত থেকে যায়। তাহলে কেন এই অতিরিক্ত উৎপাদন? কেন সরকারকে এর জন্য শুধু শুধু অর্থ ব্যয় কতে হবে? যেসকল বেসরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো অলসভাবে পড়ে আছে বা উৎপাদনের সক্ষমতা নেই, তাদেরকে কেন এই ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হবে? দু:খজনক যে, এই চার্জের টাকা জনগনের কষ্টার্জিত ট্যাক্সের টাকাতে দেওয়া হবে এবং অন্যদিকে বিদ্যুৎবিল বাড়িয়ে জনগনের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। [প্রথমআলো: ০৫/০৫/২০২৪; ডেইলি স্টার-বাংলা: ০৯/০৬/২০২৪]।

সুতরাং কর আদায়ে সরকারকে কৌশলী হতে হবে এবং কর ন্যয্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে অর্থাৎ সঠিকভাবে সম্পদ সংগ্রহ ও তা পুনঃবন্টকারীর ভূমিকা নিতে হবে। সেক্ষেত্রে ধনীব্যক্তিদের কাছ থেকে বেশী কর আদায় করে এর অর্থ সাধারন ও গরীব জনগনের কল্যানে ব্যায় করতে হবে। বিশেষ করে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, পানি, জ্বালানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সেবায় বরাদ্দ বাড়িয়ে এদের জীবন যাত্রা মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

গ. রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে অপ্রদর্শিত অর্থনীতি ও অর্থ পাচার বড় বাধা

১. কালো টাকা সাদা করার রাজনৈতিক অর্থনীতি:

বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনার অন্যতম দুর্বল ভিত্তি হচ্ছে অপ্রদর্শিত অর্থনীতি। সরকার এই অপ্রদর্শিত অর্থনৈতি কিভাবে মোকাবেলা করবে তার কোন ফলপ্রসু উদ্যোগ না নিয়ে বরং প্রতি বছরের ন্যায় নতুন বছরেও ১৫% কর দিয়ে সকল অসাধূ ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীদেরকে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিচ্ছে। এতে রাজস্ব

ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি এবং আর্থিক অনিয়ম আরোও উৎসাহিত হবে যা কালো টাকার বিস্তার ঘটাতে সহায়ক হবে। এতে করে প্রকৃত কর প্রদানকারীরা নিরুৎসাহিত হবে। মাত্র ১৫% কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়ার বিপরীতে সৎ করদাতাদের সর্বোচ্চ ৩০% কর দেয়ার বিধান বৈষম্যমূলক এবং অসাংবিধানিক। আমরা মনে করি, সরকার কিছু অসাধু ব্যবসায়ির স্বার্থে এই সুবিধা প্রদান করছে যাতে করে বিপুল পরিমান অর্জিত কালো টাকার সম্পদ সাদা করে ব্যাংক হতে নামে-বেনামে ঋণ নিয়ে তা আর পরিশোধ না করে বিদেশে পাচার করে দেয়া বা আরোও অবৈধ সম্পদ তৈরি করা।

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিভিন্ন অর্থনীতিবিদদের মতে, দেশের অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির পরিমাণ মোট জিডিপি'র ৪৮% হতে ৮৪%। এর গড় হার (৫০%) বিবেচনা করলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই অর্থনীতির (জিডিপি হিসেবে) পরিমাণ ২৫ লক্ষ ২৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি এবং যা উক্ত বছরের জাতীয় বাজেটের সাড়ে ৩ গুনেরও বেশি। এক্ষেত্রে যদি কালো অর্থনৈতিক কার্যাবলীসমুহকে উন্মোচন করা যায় তাহলে একদিকে যেমন জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, তেমনি দেশী-বিদেশী ঋণ গ্রহনের প্রবনতা কমবে, প্রত্যক্ষ কর আদায়ের হার বৃদ্ধি পাবে এবং পরোক্ষ কর (ভ্যাট) নির্রশীলতা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। এ কর্মকান্ডের প্রভাবে সরকারের ঘাটতি বাজেটের আশংকা হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির তথ্য অনুযায়ী গত ৫০ বছরে বাংলাদেশে মোট পুঞ্জীভূত কালোটাকার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৩২ লাখ কোটি টাকা। আর পাচার হওয়া অর্থের পরিমাণ ১১ লাখ ৯২ হাজার কোটি টাকা। সেখান থেকে আগামী অর্থবছরে যদি কালো টাকার মাত্র ০.৯৮% ও পাচার হওয়া অর্থের ০.৪৯% উদ্ধার করা যায়, তাহলে সরকারের আয় হবে ১৫ হাজার কোটি টাকা। [বাংলা ট্রিবিউন, ০৩/০৬/২০২৪]।

Global Financial Integrity (GFI) -এর রিপোর্ট অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আড়ালে প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে গড়ে ৬৪,০০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। ২০১৬ থেকে ২০২০, এই ৫ বছরে পাচারকারীরা ৩,২০,০০০ কোটি টাকা পাচার করেছে, যার মধ্যে শুধু ২০১৫ সালে ১ বছরেই পাচার হয়ে যায় ৯৮,০০০ কোটি টাকা। পাচারকৃত টাকার পরিমাণ বিবেচনায় দক্ষিণ এশিয়ায় পাচারকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান ২য়।

Bangladesh Financial Intelligence Unit (BIFU) এর মতে এই অর্থ মূলত: আমদানি-রপ্তানির সময় পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন, বিল কারচুপি, ঘুষ, দুর্নীতি, আয়কর গোপন ইত্যাদির মাধ্যমে বিদেশে পাচার হয়েছে। অর্থ পাচার রোধে সরকারের কিছু নীতিমালা থাকলেও এর সুষ্ঠু ও কার্যকর বাস্তবায়নের অভাবে দেশ থেকে অর্থ পাচার রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। [সময় নিউজ: ১৪/০৫/২০২২]।

বাংলাদেশের শুল্ক গোয়েন্দাদের মতে, তৈরি পোশাক রপ্তানির আড়ালে দেশ থেকে ৮২১ কোটি টাকার বেশি অর্থ বিদেশে পাচার হচ্ছে। তাদের তথ্য মতে, এটি পুরো ঘটনার ছোট একটি অংশ মাত্র, পাচারের আসল চিত্র আরও অনেক বড়। [বিবিসি নিউজ বাংলা, ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩]

বর্তমানে ডলার সংকটের পেছনে হুন্ডি ব্যবসা দায়ি এবং তা বন্ধ হলে দেশের ডলার বাজারে চলমান অস্থিরতা কাটবে। এজন্য ছোট ছোট চুনোপুঁটির চেয়ে রাঘববোয়ালদের বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) বলছে, ৫ হাজারের বেশি এজেন্ট বিভিন্ন মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবাদাতা (এমএফএস) প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হুন্ডির কারবার চালাচ্ছে। ২০২১ থেকে ২০২২ সালের জুলাই পর্যন্ত ৭৫,০০০ কোটি টাকা (৭.৮ বিলিয়ন ডলার) পাচার করেছে হুন্ডি ব্যবসায়ীরা। [বাংলাদেশ প্রতিদিন: ০৬/০৯/২০২৩]

ঘ. ট্যাক্স-ভ্যাটের চাপ বেড়েই চলেছে

আইএমএফ এবার সব ভ্যাট ১৫% করে দিতে সরকারকে চাপ দিচ্ছে এবং সরকার সে পথেই এগুচ্ছে। চলতি অর্থবছরে ভ্যাট ছিল মোট রাজস্বের ৩৮% যা এই অর্থবছরে হতে পারে ৫০% ওপরে। ভ্যাট সব সময় নিম্নে যে থাকে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের ওপরে পড়ে এবং এই মূল্যস্ফীতির যুগে তা আরও বোঝা হয়ে যাবে। এই পরোক্ষ কর দেশের দারিদ্র্যের হারের ওপর চাপ বাড়াচ্ছে, যার কারণে তা প্রত্যাশিত মাত্রায় এর হার কমছে না। রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‍্যাপিড) পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায়, পরোক্ষ করের বোঝা এক শতাংশ পয়েন্ট বাড়লে দারিদ্র্য বাড়ে ০.৪২ শতাংশ। যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স ফাকি দিচ্ছে, তাদের না ধরে রাজস্ব আদায়ের সহজ হাতিয়ার হিসেবে ভ্যাট-এর হার ও এর আওতা বাড়ানো হচ্ছে।

তদ্রুপ ট্যাক্স আয় বাড়াতে সরকার অগ্রিম আয়করের দিকে বেশি নজর দিচ্ছে। এর ফলে যারা ট্যাক্স দেন, তাঁদের ওপর চাপ পড়বে। এই অর্থবছরে সরকারি চাকরিজীবীদের বেশির ভাগ ভাতায় আয়করমুক্ত থাকলেও বেসরকারি চাকরিজীবীদের জন্য তা ছিল ৪.৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত। এ ছাড়া বিভিন্ন বিনিয়োগে কর রেয়াত ছিল, কিন্তু এসব সুবিধা উঠিয়ে দিলে সাধারণ মানুষের ওপর বিশাল চাপ বাড়বে। তাই আমাদের দাবি করের নিম্ন হার বাড়ালেও সঙ্গে নিম্ন সীমা ৫ লাখ এবং আগের ভাতা এবং রেয়াত সুবিধা বজায় রাখা। এ ছাড়াও সরকারি চাকরিজীবীদের যে দ্বৈত আইন করে সব ভাতাতে করমুক্ত করা হয়েছে, তা বাতিল করা হোক অথবা বেসরকারি চাকরিজীবীদের জন্যও একই সুবিধা দেওয়া হোক। একই দেশে দুই আইন থাকতে পারে না। [প্রথম আলো: ০৫/০৫/২০২৪]

ঙ. ঋণ খেলাপী ও ব্যাংকিং সেক্টরে অস্থিরতা ও বিনিয়োগ সংকট

ব্যাংকগুলোর অনিয়ম ও জালিয়াতি দিন দিন বেড়েই চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংক-এ তথ্য অনুযায়ী গত ৩ মাসে (জানু-মার্চ, ২০২৪) খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩৬,৬৬২ কোটি টাকা এবং মার্চে'২৪ শেষে তা বেড়ে হয়েছে ১,৮২,২৯৫ কোটি টাকা। গত ২০১৫ সালে খেলাপী ঋন ছিল ৫০,১৫৫ কোটি টাকা, সে হিসেবে মার্চ'২৪ শেষে খেলাপী ঋন বেড়েছে প্রায় ৪ গুন বা ২৬২%। তার মধ্যে শুধুমাত্র গত ১ বছরে রাষ্ট্রায়ত্ত ৬ ব্যাংকের (সোনালী, রুপালী, অগ্রনী, জনতা, বেসিক ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক) খেলাপী ঋন বেড়েছে ৮৫,৮৬৯ কোটি টাকা (৪২%)। এর মধ্যে শীর্ষ ২০ ঋণখেলাপীর কাছে ব্যাংকগুলোর পাওনা ৩৫,০০০ কোটি টাকা।

শুধু বেসরকারি কোম্পানি নয়, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোও এখন ঋণখেলাপিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪-

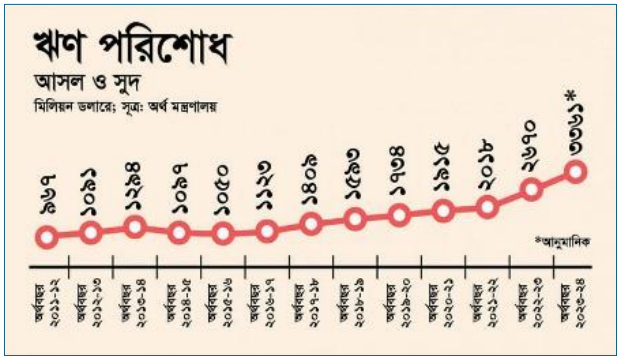

এর তথ্য অনুযায়ী, রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর কাছে ৮টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১৮৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি খেলাপি ঋণ বিজেএমসির যা পরিমান ১৩১ কোটি ৩০ লাখ টাকা বা ৭১.৩৬%। [প্রথম আলো, ১০/০৬/২০২৪]

সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) বলছে, গত ১৫ বছরে সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক থেকে ২৪টি ছোট-বড় অনিয়মের মাধ্যমে ৯২,২৬১ কোটি টাকা লুট হয়েছে; যা চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২৪) বাজেটের ১২ শতাংশের বেশি এবং মোট স্বাস্থ্য বাজেটের প্রায় ২.৫ গুন। [বিবিসি নিউজ বাংলা: ২৪/১২/২০২৩]

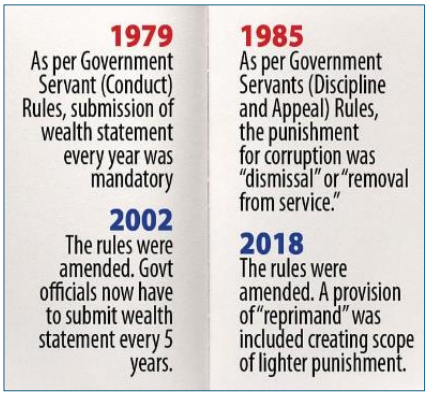

প্রতিবছর খেলাপী ঋনের এই দুর্নাম ঘোচাতে ঋনের অবলোপন করা হয়। ব্যাংকগুলো গত ২০ বছরে (২০০৩ থেকে গত জুন ২০২৩ পর্যন্ত) ৬৭,৪৪০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ অবলোপন করেছে, ফলে অবলোপন বেড়েছে ১৮ গুণের বেশি। এর ফলে ব্যাংগুলোতে তারল্য সংকট সৃষ্টির কারনে ঋণ প্রবাহ ব্যহত হচ্ছে। ফলে ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এই ঋন গুলোর পেছনে বেশির ভাগই রাঘোব-বোয়ালদের হাত থাকায় এর আদায় যথাযথ ভাবে হচ্ছেনা অথচ কৃষকরা ঋণ নিলে তা আদায়ে কোন প্রকার ছাড় দেয়া হয় না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জেলেও যেতে হয়। [ডেইলি স্টার বাংলা: ০৬-জুন'২৪; পেসেঞ্জার ভয়েস: ২৫-জুন'২৪]।

সরকার দুর্বল ব্যাংগুলো একিভুতকরনের উদ্যোগ গ্রহন করেছে, যার মধ্যে রেড জোনে আছে ১০টি ব্যাংক। আমরা মনে করি ঋণ খেলাপিদের সুযোগ করে দিতেই এই একিভুতকরনের ব্যবস্থা। সীমাহীন দুর্নীতির মাধ্যমে অপরিকল্পিত ও অপ্রয়োজনীয় ঋণ বিতরণের মাধ্যমে এসব ব্যাংককে দুর্বল ব্যাংকে পরিণত করা হয়েছে। [প্রথম আলো: ১৫/০৪/২০২৪]

চ. কর ফাকি কি বন্ধ করা গেছে?

৩১-জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ই-টিআইএন নিবন্ধনের সংখ্যা ৯৯,৬৯,৫১৫ জন, যা মোট জনসংখ্যার ৬%। ২০২৩-২৪ করবর্ষে রিটার্ন জমা পড়েছে ৩৬,৬২,০০০টি যা মোট জনসংখ্যার ২% এবং ই-টিআইএন নিবন্ধনের ৩৭%। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর মতে ৭.৭ কোটি মানুষের আয়কর প্রদানের সক্ষমতা আছে। দু:খজনক হচ্ছে, এনবিআর সে দিকে নজর না দিয়ে যারা নিয়মিত আয়কর দিচ্ছেন তাদের কে নানা ভাবে হায়রানি এবং আইনের বেড়াজালে ফেলছেন।

প্রকৃত আয় কম দেখিয়ে ব্যক্তি ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো কর ফাঁকি দিয়ে থাকে। কর ফাঁকি ও অস্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার কারণে সরকার বছরে ৫৫,০০০ কোটি টাকা থেকে ২,৯২,৫০০ কেটি টাকা রাজস্ব হারাচ্ছে। হারানো রাজস্বের এই পরিমাণ সে সময়ের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বরাদ্দের ৮গুণ; আর স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দের দ্বিগুণ। এ অর্থ আদায় করা গেলে স্বাস্থ্য খাতে মাথাপিছু ব্যয় ১,৮৬২ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৬,৮৪৪ টাকা এবং শিক্ষা খাতে ৪,৬৫৬ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৯,৬৩৮ টাকা করা যেত। কর ফাঁকি ও কর এড়ানোর দৃষ্টিতে ১৪১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৫২তম। [বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম: ০৩/০৪/২০২৩, যুগান্তর: ০৪/০৪/২০২৩]

ছ. সরকারি কর্মকর্তা/আমলাদের দূর্নীতি বিরোধী আইন শীথিল

সরকারি কর্মকর্তাদের দূর্নীতি বিরোধী আইন শীথিল করার ফলে তাদের দুর্নীতি আরো বেড়ে গেছে বরে আমরা মনে করি। ১৯৭৯ সালে প্রনীত Government Servant (Conduct) Rules অনুযায়ী প্রতি বছর সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদের বিবরণী প্রদান বাধ্যতামূলক ছিল, যা ২০০২ সালে পরিবর্তন করে ৫ বছর পর পর এই সম্পদের বিবরণী প্রদানের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৮৫ সালে প্রনীত Government Servant (Discipline and Appeal) Rules অনুযায়ী কোন সরকারি কমকর্তা দূর্নীতি করলে তাকে বরখাস্ত বা চাকুরি হারানোর নিয়ম থাকলেও ২০১৮ সালে তা পরিবর্তন করে শুধুমাত্র আর্থিক দন্ড বা পদাবনতির কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ বরখাস্ত বা চাকুরি হারানোর কোন ভয় নাই। উল্লেখ্য, জনাব প্রমথা রঞ্জন ঘটক, সহকারি সচীব থাকা অবস্থায় ২০২০ থেকে ২০২১ সালে সরকারি জমি বরাদ্দ সংক্রান্ত বিষয়ে ৭.৩৫ কোটি টাকা আত্মস্যাৎ করেন। এর ফলে তাকে সিনিয়র সহকারি সচীব পদ হতে সহকারি সচীব পদে পদাবনিত করা হয়। এতে করে সৎ কর্মকর্তাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবার বা অসৎ হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। আমরা সাম্প্রতি পুলিশ এবং রাজস্ব বিভাগের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা কর্তৃক হাজার কোটি টাকার দূর্নীতির খবর বিভিন্ন পেপার-পত্রিকায় দেখেছি। সরকারের অন্য সেক্টরে যে এ ধরনের দূর্নীতি হচ্ছে না, তার গেরান্টি কে দিবে? এসব হাজার কোটি টাকাতো জনগনের ট্যাক্সেরই টাকা। [ডেইলি স্টার: ২৯/০৬/২০২৪]

জ. আমাদের প্রস্তাবনা

- ব্যাংক লুট, অর্থপাচার, দুর্নীতি ও চোরাচালান রোধে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করতে হবে।
- আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রনে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা।
- বহুজাতিক কোম্পানি গুলো যাতে প্রকৃত আয় গোপন করতে না পারে তার জন্য বিশেষ মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে এবং এদের অডিট রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে।
- বিভিন্ন দেশের সাথে তথ্য আদান প্রদান ও ব্যাংক লেনদেনের স্বচ্ছতার উপর আন্ত-দেশীয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে এবং পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।
- সরকারের আভ্যন্তরীন নিরীক্ষা জোড়দার করতে হবে এবং পূর্বের অডিট আপত্তির বিপরীতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।
- বাংলাদেশী নাগরিকদের বা কোন দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পন্ন বাংলাদেশীদের বিদেশে সম্পদ ও ব্যাংক একাউন্ট থাকলে তাকে ফি-বছর বিবরণী বাংলাদেশে দিতে হবে। তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।
- বিদেশীদের চাপে ভর্তুকি না কমিয়ে সরকারী বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে ঘাটতি সমন্বয় করতে হবে।
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও সেক্টরে সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করার জন্য "Public Expebditure Review Commission" করতে হবে এবং সে অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাতে হবে।
- প্রত্যক্ষ কর ফাকি রোধে এনবিআর-কে শক্তিশালী, নিরপেক্ষ, স্বজ্ছ ও প্রভাবমুক্ত হতে হবে যাতে করে পরোক্ষ কর তথা ভ্যাট-এর উপর নির্ভরশীলতা কমে।
- বেনামী সম্পদ কেনা বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন দেশের এই সংক্রান্ত আইন অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- Government Servant (Conduct) Rules এর ২০০২ সালের সংশোধিন আইন বাতিল করে পুন:রায় ১৯৭৯ সালের আইনে ফিরে যাওয়া এবং Government Servant (Discipline and Appeal) Rules এর ২০১৮ সালের সংশোধিন আইন বাতিল করে পুন:রায় ১৯৮৫ সালের আইন প্রনয়ন করা। যেখানে প্রতি বছর সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদের বিবরণী প্রদান বাধ্যতামূলক ছিল এবং দূর্নীতি প্রমান হলে বরখাস্ত বা চাকুরি বাতিলের বিধান ছিল।

মো: আহসানুল করিম । কোস্ট ফাউন্ডেশন/ইক্যুইটিবিডি । তাং ২৯/০৬/২০২৪